প্রানের প্রান জাগিছে তোমারি প্রানে -৫

অভিজিৎ রায়
www.mukto-mona.com

পূর্ব্বর্তী পর্বের পর ...

আগুনের পরশমনি ছোঁয়াও প্রাণে, এ জীবন ধন্য কর :

বিজ্ঞানীরা বিজ্ঞানকে ব্যবহার করে ল্যাবটেরীতে কি কখনও প্রাণ সৃষ্টি করতে পারবে? এই প্রশ্নের সঠিক জবাব দেওয়া আজকের দিনের বিজ্ঞানীদের জন্য একটি মস্ত বড় চ্যালেঞ্জ। এই চ্যালেঞ্জের জবাব দিতেই ওপারিন ও হালডেন প্রস্তাবিত জীবনের রাসায়নিক বিবর্তনের অনুকল্পটির সত্যতা যাচাই করা বেশ জরুরী একটি ব্যাপারে পরিণত হয়েছিল একটা সময়। ইউরে-মিলারের ঐতিহাসিক পরীক্ষাটি নিঃসন্দেহে জীবনকে বৈজ্ঞানিকভাবে বুঝবার ক্ষেত্রে একটি বড় অর্জন। এই পরীক্ষার ফলাফল থেকেই আমরা জেনেছি কৃত্রিমভাবে কোন জীবন বা জীবকোষ তৈরী করা এখনও সম্ভব না হলেও অনেক সরল অজৈব অণু (H_2, NH_3, CH_4, H_20, HCN প্রভৃতি) থেকে কোষের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাসায়নিক উপাদান সমূহ তৈরী করা সম্ভব হয়েছে, ল্যাবরেটরীতেই। আমার এই সিরিজের চতুর্থ পর্বটি যারা পড়েছেন, তাদের মনে থাকবার কথা যে, মিলারের পরীক্ষায় বিক্রিয়া ঘটানোর জন্য সরবরাহ করা হয়েছিল বিদ্যুৎ প্রবাহ, অতিবেগুনী আলো, উচ্চ শক্তির বিকিরন আর তাপ। এগুলো সবই কিন্তু আদিম পৃথিবীতে ছিল। কাজেই আদিম বিজারকীয় পরিবেশে অজৈব পদার্থ থেকেই জৈবপদার্থ উন্মেষের ধারণাটিকেই প্রাণ সৃষ্টির প্রাথমিক ধাপের ক্ষেত্রে সবচাইতে গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা হিসেবে বিজ্ঞানীরা গ্রহণ করে নিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে বিজ্ঞানী মিলারের ১৯৯৬ সালের অক্টোবর মাসের একটি সাক্ষাৎকারের কিছু অংশ পাঠকদের জন্য তুলে ধরা মনে হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। সাক্ষাৎকারে ডঃ মিলার বলছেন :

> We really don't know what the Earth was like three or four billion years ago. So there are all sorts of theories and speculations. The major uncertainty concerns what the atmosphere was like. This is major area of dispute. In early 1950's, Harold Urey suggested that the Earth had a reducing atmosphere, since all of the outer planets in our solar system- Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune- have this kind of atmosphere. ... Although there is a dispute over the composition of the primitive atmosphere, we've shown that either you have a reducing atmosphere or you are not going to have the organic

> compounds required for life. If you don't make them on Earth, you have to bring them in on comets, meteorites or dust. Certainly some material did come from these sources. In my opinion the amount from these sources would have been too small to effectively contribute to the origin of life.

ইউরে-মিলারের পরীক্ষাটি নিঃসন্দেহে একটি বড় মাইল ফলক, জীবনকে বুঝবার জন্য, জীবনের বস্তুবাদী ধারণাটিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্য। কিন্তু এ পরীক্ষার ফলাফলই শেষ কথা নয়। কারণ জৈব অণুগুলো জীবন গঠনের প্রথমিক উপাদান হতে পারে, কিন্তু কোন ভাবেই 'জীবন' (life) নয়। জীবনকে বুঝবার জন্য, মানে জীবনের প্রক্রিয়াটিকে উপলব্ধি করবার জন্য বিজ্ঞানীরা তাই ল্যাবরেটরীতে বিভিন্ন পরীক্ষার ব্যবস্থা করেছেন, যেগুলোকে ইংরেজীতে বলে 'সিমুলেশন এক্সপেরিমেন্ট'। এই সিমুলেশন এক্সপেরিমেন্ট গুলো আমাদের সামনে বিভিন্ন ধরনের আকর্ষনীয় সম্ভাবনার বার্তা নিয়ে হাজির হয়েছে; যেমন, জাগিয়ে তুলেছে নিউক্লিয় এসিডের উপাদান কিংবা এডেনোসাইন ট্রাইফসফেট (এ.টি.পি) তৈরীর হওয়ার গুরুত্বপূর্ণ সম্ভাবনাকে - যেগুলো আসলে কাজ করে জীবজগতে শক্তির আধার হিসেবে। অনেক বিজ্ঞানীই মনে করেন যে, জীবন বা জীবনের ভিত্তিপ্রস্তর আসলে প্রকৃতির বিভিন্ন ধরনের সিমুলেটেড পরীক্ষারই ফলাফল। বিজ্ঞানীরা আরো মনে করেন, যে বিক্রিয়াগুলোর মাধ্যমে অজৈব পদার্থ থেকে জীবনের সরল অণু গঠিত হয়েছিল, সেগুলো সম্পন্ন হয়েছিল আসলে সমুদ্রের গভীর তলদেশে, বিজ্ঞানী হালডেন যাকে বলেন, 'উত্তপ্ত লঘু স্যুপ' (Hot dilute soup)। তবে বর্তমানে বিজ্ঞানীরা আরেকটি সম্ভাবনার কথাও বেশ জোরে সোরে বলছেন; সেটি হল, জৈব অণুগুলো সমুদ্রের স্যুপে গঠিত হয়নি, বরং তৈরী হয়েছিল পানিতে ডুবে থাকা এক ধরনের পাথুরে খনিজে; আর নয়ত জটিল, আধান যুক্ত কাদামাটির পিঠে। কাদা মাটির কথা বলা হল বটে, তবে এটি মনে রাখতে হবে, আজকের দিনে মাটি বলতে আমরা যা বুঝি, সেসময়কার মাটি ছিল এ থেকে ভিন্ন। জৈব ধবংসাবশেষ মিশ্রত জটিল সিলিকেট, যা এখনকার মাটির উপাদান, তা তখনও বিকশিত হয়ে ওঠেনি। আসলে চুর্ণ সিলিকেট, কোয়ার্জ, বা অন্যান্য আকরিকের ভগ্নস্তুপের জলীয় আবরণে আদি বিক্রিয়াগুলো সম্পন্ন হয়েছিল বলে করা হয়। অনুমান করা হয়, শুধু অ্যামিনো এসিড তৈরীতেই নয়, অ্যামিনো এসিডগুলো পরস্পর বিক্রিয়া করে (ডি হাইড্রেশন) যে পলিপেপটাইড বা প্রোটো-প্রোটিন গড়েছিল, তার পেছনে প্রাচীন কাদা-মাটি আর খনিজ পদার্থগুলো একটা অনুঘটকের ভূমিকা পালন করেছিল। অন্যান্য বৃহৎ বায়োপলিমারগুলোও প্রায় একইরকম অনুঘটক দিয়ে প্রভাবিত হয়ে উৎপন্ন হয়েছিল। ব্যাপারটা মোটেই অসম্ভব বা অস্বাভাবিক কিছু নয়। আজকের দিনেও আমরা দেখি রাসায়নিক শিল্পকারখানাগুলোতে জৈব পদার্থ তৈরীর জন্য অহরহই নানা ধরনের খনিজ ব্যবহার করা হচ্ছে।

ইউরে-মিলারের পরীক্ষায় বিজারকীয় পরিবেশে অজৈব পদার্থ থেকে জৈব অণু সফলভাবে

উৎপন্ন করার পর বিজ্ঞানীদের প্রচেষ্টা শুরু হয় জীবনের পরবর্তী ধারাবাহিকতা গুলো জানবার, বুঝবার। এ প্রসঙ্গে আমেরিকার মায়ামি ইউনিভার্সিটির সিডনি ফক্সের গবেষণার কথা একটু পাঠকদের বলা যাক, কারণ তার গবেষণা থেকেই আদি জীবকোষ তৈরীর একটা স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে । মিলারের পরীক্ষায় পাওয়া এমিনো এসিড, অ্যাসপারটিক আর গ্লুটামিক এসিডগুলোকে নিয়ে অধ্যাপক ফক্স উত্তপ্ত করলেন - ১৩০ থেকে ১৫০ ডিগ্রী ফারেনহাইট তাপমাত্রায়; ফলে প্রোটিনের মত একটি দ্রব্য উৎপন্ন হল। এর নাম দেওয়া হল *তাপীয় প্রোটিনয়েড*। এটি অনেক দিক দিয়েই প্রকৃতিতে পাওয়া প্রোটিনের মত। অধ্যাপক ফক্স, এই সব প্রোটিনয়েডকে পানিতে সিদ্ধ করে ঠান্ডা করে পেলেন অনেকটা আদি কোষের মত দেখতে ঝিল্লিবদ্ধ *প্রোটিনয়েড মাইক্রোস্ফিয়ার*। অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখলে এগুলোকে একেবারে আদি কোষের মত দেখায়; শুধু তাই নয় - ল্যাবরেটরীতে উৎপন্ন এই মাইক্রোস্ফিয়ার গুলোকে কৃত্রিম ভাবে জীবাশ্মে পরিণত করেও দেখা গেছে প্রায় তিনশ কোটি বছর আগেকার প্রাথমিক জীবাশ্ম গুলোর সাথে এর অবিকল মিল!

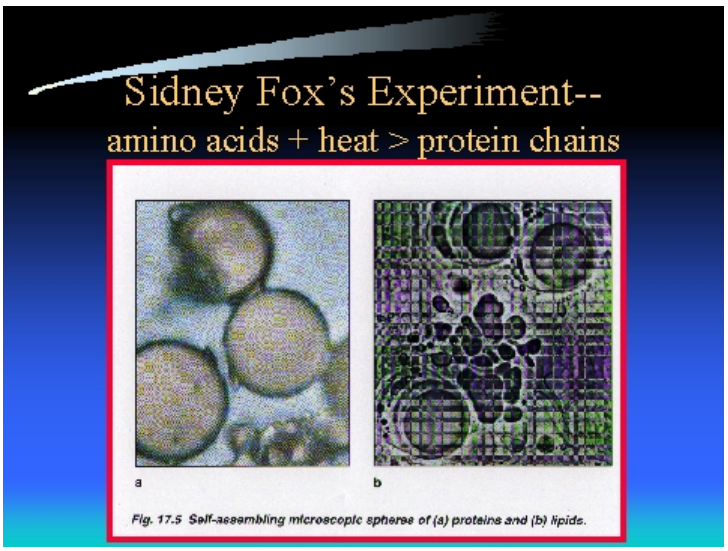

এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই মাইক্রোস্ফিয়ারগুলো কি জীবিত? মানে এদের কি সত্যই কোন প্রাণ আছে? প্রশ্নটি অধ্যাপক ফক্সকে করেছিলেন টিম বেড়া (Evolution and the Myth of Creationism, 1990, pp 75 দ্রষ্টব্য)। এমনতর বেয়ারা প্রশ্ন করবার কারণও আছে। এই প্রোটিনয়েড মাইক্রোস্ফিয়ারগুলো প্রোটিনের দুটি স্তরে বিন্যস্ত, এরা বৈদ্যুতিকভাবে সক্রিয়, এর বহির্ভাগটি দেখতে অনেকটা কোষের মেমব্রেনের মতই। এদেরকে যদি দ্রবণের মধ্যে বাধাহীন ভাবে বিচরনের সুযোগ দেওয়া হয়, এরা একই রকমের প্রোটিনয়েড শোষণ করে 'বৃদ্ধি প্রাপ্ত' হয়। এরা ঈষ্ট বা ব্যাকটেরিয়ার মতই নড়াচড়া করে, অঙ্কুরিত হয়। কোষ বিভাজনের মত একধরণের বিভাজনও ঘটে এদের। এটিপি সরবরাহ করা হলে এদের বিচলন ক্ষমতাও বেড়ে যায়। মাইক্রোস্ফিয়ারগুলো অসমোটিক (Osmotic) আর নির্বাচিত বিশোষণ

মূলক (selective difussion) ধর্ম প্রদর্শন করে, যা কিনা জীবিত কোষের মধ্যেই কেবল দেখা যায়। তার পরেও এই মাইক্রোস্ফিয়ার গুলো জীবিত কিনা, টিম বেড়ার এই প্রশ্নের উত্তরে ফক্স বলেছিলেন, এগুলো 'প্রোটো-এলিভ' মানে, 'জীবন সদৃশ'।

অধ্যাপক ফক্স কিন্তু চাতুরী করে বেড়ার প্রশ্ন এড়িয়ে যান নি, তিনি এমনতর উত্তর দিয়েছিলেন, কারণ বিজ্ঞানের চোখে প্রাণ আর অ-প্রাণের সীমারেখাটা খুব স্পষ্ট আর পরিস্কার নয়। যেহেতু অজৈব জড় পদার্থ থেকেই প্রাণ বা জীবনের বিকাশ ঘটেছে, সুতরাং জড় জগৎ আর জীব জগতের মাঝামাঝি জায়গায় আমারা সাদামাঠাভাবে একটা সীমারেখা সবসময়ই আঁকতে পারি যেটা অতিক্রম করলে সমস্ত কিছুই জীবিত, আর ওই সীমা না পেরুলে সমস্ত কিছুই প্রাণহীন। আমরা সিরিজের দ্বিতীয় পর্বে ভাইরাস নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে দেখেছি, ভাইরাসরা এমনিতে 'মৃতবৎ', তবে তারা 'বেঁচে' ওঠে অন্য জীবিত পোষকদেহ বা জীবিত কোষকে আশ্রয় করে। কাজেই ভাইরাসেরা বাস করে ওই প্রাণ অ-প্রাণের সীমারেখা বা বর্ডার লাইনের ঠিক মাঝখানে। তবে ভাইরাসগুলোই যে প্রাণের সবচেয়ে সরলীকৃত রূপ, তা কিন্তু নয়। ভাইরাসের চেয়েও সরল প্রাণের সন্ধান বিজ্ঞানীরা পেয়েছেন ভাইরইডস (Viroids) এর মধ্যে। এরা মূলতঃ পেঁচানো সরল জেনেটিক পদার্থ দিয়ে তৈরী, যেগুলোকে টেনে লম্বা করলে বেড়ে ৩ ফুটের মত দাঁড়ায়। এই ভাইরইডস জীবাণুর কারণে গাছপালায় 'avocado sun blotch', 'coconut cadang cadang' কিংবা 'tomato bunchy top' জাতীয় বিদঘুটে নামের নানা ধরণের রোগের সৃষ্টি হয়। ভাইরাসের মত ভাইরইডসদেরও জীবিত হওয়ার জন্য 'পোষক দেহ' দরকার হয়, নইলে এরাও জড় পদার্থের মতই আচরণ করে। ভাইরইডসই শেষ নয়, এর চেয়েও ক্ষুদ্র পরিসরে বিজ্ঞানীরা জীবনের সন্ধান পেয়েছেন। যেমন ওই প্রিয়ন গুলোর (prions) কথাই ধরা যাক। এগুলোর আকার এখন পর্যন্ত পাওয়া সবচাইতে ছোট ভাইরাসগুলোর একশ ভাগের এক ভাগ থেকে শুরু করে এক হাজার ভাগের এক ভাগ পর্যন্ত। আর এগুলো এতই সরল যে এর মধ্যে জেনেটিক উপাদানও নাই, এগুলো স্রেফ প্রোটিন দিয়ে তৈরী। ভাইরাস আর ভাইরইডসের মত এরাও জীবকোষে ঢুকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার দখল নিয়ে নেয়। গবাদি পশু বিশেষত ভেরার মধ্যে *স্ক্রাপি* (scrapie)নামে একধরনের রোগের জন্য এই প্রিয়নগুলোকে দায়ী করা হয়। এই যে কিছুদিন আগে *ম্যাড কাউ* রোগ নিয়ে সারা পৃথিবী জুড়ে এত তোলপার হল, এর পেছনেও কিন্তু দায়ী ওই প্রিয়নেরা। শুধু পশু পাখি নয়, মানবদেহে 'multiple sclerosis', 'Creutzfeld-Jacob', 'Gerstmann-Straussler-Scheinker syndrome', আর 'Lou Gehrig's' রোগের জন্যও এই প্রিয়নেরাই সম্ভবত দায়ী। প্রিয়নেরা বিজ্ঞানীদের জন্য সবসময়ই একটি বিস্ময়; কারণ, জেনেটিক পদার্থ (জিনোম আর নিউক্লিয়িক এসিড) বিহীন এই অদ্ভুতুরে হতচ্ছারা জিনিসটা শুধু প্রোটিন দিয়ে তৈরী হওয়া সত্ত্বেও কোষের অভ্যন্তরে উপযুক্ত পরিবেশে প্রাণের অভিব্যক্তি ঘটাতে পারে, রোগ ছড়াতে পারে। প্রিয়নের আস্তিত্ব জীববিজ্ঞানের এতদিনকার গড়ে ওঠা 'বিশ্বাসে' আঘাত করেছে - যেটি বলত, প্রতিটি জীবন্ত অবয়বের অনুলিপির জন্য নিউক্লিয় অ্যাসিড অত্যাবশ্যক। এখন জীব-জড়ের পার্থক্যসূচক বর্ডার লাইটি টানতে গিয়ে কিন্তু বিপদেই পড়ব আমরা। এটা কি ভাইরাসের উপর দিয়ে টানা

হবে, নাকি প্রিয়নের উপর দিয়ে টানা হবে - এ প্রশ্ন উঠতেই পারে। আবার, প্রিয়ন, ভাইরইডস আর ভাইরাসকে 'প্রাণ' হিসেবে, কিংবা প্রাণের সরলতম প্রকাশ হিসেবে অভিহিত করতে অনেকেই আপত্তি তুলবেন। কারণ, এটা তো সত্যই যে, এদের মধ্যে প্রাণের নান্দনিক বিকাশ ঘটে তখনই যখন তারা উপযুক্ত জীবদেহ খুঁজে পায়। সে হিসেবে কিন্তু মাইক্রোস্ফিয়ার, যেগুলোর কথা আমরা একটু আগেই আলোচনা করেছি সেগুলোই হয়ত প্রথম জীবন বা জীবের পূর্বসুরী ছিল- একথা স্বীকার করে নিতেই হবে। কারণ মাইক্রোস্ফিয়ারের সাথে প্রোটোসেল বা আদিকোষের মিল অনেক। অধ্যাপক ফক্স যে ল্যাবরেটরীতে মাইক্রোস্ফিয়ারের সন্ধান পেয়েছিলেন, সেই *প্রোটিনয়েড মাইক্রোস্ফিয়ার* গুলোই আসলে আদি কোষের উৎপত্তিতে অন্তরবর্তী ধাপ ছিল।

জীবনের রাসায়নিক বিবর্তনের ধাপসমূহ :

মোটামুটিভাবে যে ধাপগুলো অনুসরন করে এই পৃথিবীতে প্রাণের নান্দনিক বিকাশ ঘটেছে, তা নিয়ে এবার একটু ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করা যাক। আমরা তো গত কয়েকটি পর্ব ধরে অনবরত বলেই যাচ্ছি যে, আমাদের এই মলয় শীতলা নান্দনিক পৃথিবীটা একটা সময় এত উত্তপ্ত ছিল যে, সেই আবহাওয়াতে হাইড্রোজেন, মিথেন, এমোনিয়া, কার্বন মনোক্সাইড, জলীয় বাষ্প প্রভৃতি ছাড়া অন্য কোন জৈব পদার্থ ছিল না। ছিল না সেখানে মুক্ত অক্সিজেন। কাজেই সেই বিজারকীয় পরিবেশে পরিবেশে প্রাপ্ত অজৈব পদার্থগুলো থেকে জৈব পদার্থের উৎপত্তিই হচ্ছে জীবনের প্রাথমিক ধাপ। ধাপগুলোকে ধারাবাহিকভাবে লিখলে দাড়াবে অনেকটা এরকম :

***ধাপ-১:* জৈব যৌগের উৎপত্তি :**

- হাই ড্রোকার্বন উৎপাদন (মুক্ত পরমাণুগুচ্ছ CH এবং CH_2 এর মধ্যে বিক্রিয়া, বাষ্পের সাথে মেটালিক কার্বাইডের বিক্রিয়া)
- হাই ড্রোকার্বনের অক্সি ও হাইড্রক্সি উপজাতের উৎপাদন (বাষ্প ও হাই ড্রোকার্বনের বিক্রিয়ায় এলডিহাইড, কিটোন উৎপাদন)
- কার্বোহাইড্রেট উৎপাদন (গ্লুকোজ, ফ্রুকটোজ আর ঘনীভবনের ফলে চিনি, স্টার্চ, গ্লাইকোজেন)
- ফ্যাটি এসিড ও গ্লিসারলের উৎপত্তি (ফ্যাট বা চর্বির ঘনীভবন)
- এমিনো এসিড গঠন (হাইড্রোকার্বন, এমোনিয়া আর পানির বিক্রিয়া)

***ধাপ-২:* জটিল জৈব অণুর উৎপত্তি** (পলিমার গঠন)

- প্রোটিনয়েড মাইক্রোস্ফিয়ার
- কো-এসারভেট

ধাপ-৩: **পলিনিউক্লিয়োটাইড বা নিউক্লিয়িক এসিড গঠন** (নিউক্লিয়োটাইড পলিমারিত হয়ে পলিনিউক্লিয়োটাইড; আজ থেকে প্রায় সাড়ে তিনশ কোটি বছর আগে)

ধাপ-৪: **নিউক্লিয়োপ্রোটিন গঠন** (নিউক্লিয়িক এসিড এবং প্রোটিনের সংমিশ্রণ, পরবর্তীতে লিপিডের সাথে প্রোটিন মিলে লিপোপ্রোটিন তৈরী)

ধাপ-৫: **আদি কোষ বা ইউবায়োন্ট গঠন** (কো-এসারভেটের ভিতরে নিউক্লিয়োপ্রোটিন আর অন্যান্য অণু একত্রিত হয়ে লিপোপ্রোটিন ঝিল্লি দিয়ে আবদ্ধ প্রথম কোষ; প্রথম জীবন)

ধাপ-৬: **শক্তির উৎস ও সরবরাহ** (শক্তির সরবরাহে ঘাটতি দেখা দেওয়ায়, প্রকৃতিতে টিকে রইল তারাই যারা প্রোটিনকে এনজাইমে রূপান্তরিত করে সরল উপাদান থেকে জটিল বস্তু তৈরী করতে পারত, আর সেসব দ্রব্য থেকে শক্তি নির্গত করতে পারত)

ধাপ-৭: **অক্সিজেন বিপ্লব** (অক্সিজেনহীন বিজারকীয় আবহাওয়া অক্সিজেনময় জারকীয় আবহাওয়ায় রূপান্তরিত হল - আজ থেকে দু'শ কোটি বছর আগে)

ধাপ-৮: **প্রকৃত কোষী জীবের উৎপত্তি** (prockaryote থেকে eukaryote)

ধাপ-৯: **জৈব-বিবর্তন বা Biogency** (জীব থেকে জীবে বিবর্তন)

এখানে একটি কথা মনে রাখতে হবে যে, উপরে উল্লিখিত রাসায়নিক পরিবর্তনের এই ধাপগুলো কিন্তু একদিনে সম্পন্ন হয়নি। প্রোটিন এবং নিউক্লিয়িক এসিড স্বতঃস্ফুর্তভাবে নানা ধরনের ভিন্ন ভিন্ন সমাবেশে সংগবদ্ধ হয়েছে লক্ষ কোটি বছর ধরে। প্রকৃতি নিজেই নিজের উপর আকস্মিকতার পরীক্ষা (chance experiment of nature) করেছে বিস্তর। ফলে অজৈব পদার্থ থেকে একসময় উদ্ভুত আদি কোষগুলো নিউক্লিয় এসিডের সমন্বয়ে অনুলিপির ক্ষমতা অর্জন করেছে, আর সময়ের সাথে সাথে বিবর্ধিত করেছে। আসলে সহজ কথায় সময়ের সাথে সাথে বৃদ্ধি পেয়েছে জটিলতা। এই জটিলতা বৃদ্ধিই জীবন বিকাশের এক অত্যাবশ্যকীয় শর্ত। জটিলতার অর্থ সংবাদ বা তথ্যের বৃদ্ধি। যে অণু যত সরল ও ছোট, তার ভিতরকার সংবাদ ও তথ্য তত কম। অণু যত দিনে দিনে বৃহৎ আকার অর্জন করেছে, এক থেকে বহুত্ব অর্জন করেছে, ছোট কণা থেকে বড় কণায় রূপান্তরিত হয়েছে- বৃদ্ধি করেছে জটিলতার। তাই সংক্ষেপে বলা যায়, জীবন বিকাশের আগে দরকার ছিল জটিলতা বৃদ্ধির। জটিলতা বাড়তে বাড়তে যখন জীবনোপযোগী পরিবেশ তৈরী হল, অর্থাৎ তথ্যের পাহাড় জমল, তখনই শুরু হল প্রকৃত জীবন। প্রকৃত জীবন পারল স্বপুনরাবৃত্তির ক্ষমতা অর্জন করতে; শিখল বহিঃস্থ তথ্যকে ব্যবহার

করতে। কাজেই বলা যায়, জটিলতাই হচ্ছে জীবনের ভিত্তি। নীচে একটি প্রবাহচিত্রের সাহায্যে আরেকটু সহজভাবে জীবন সৃষ্টির প্রক্রিয়াটিকে তুলে ধরা হয়েছে :

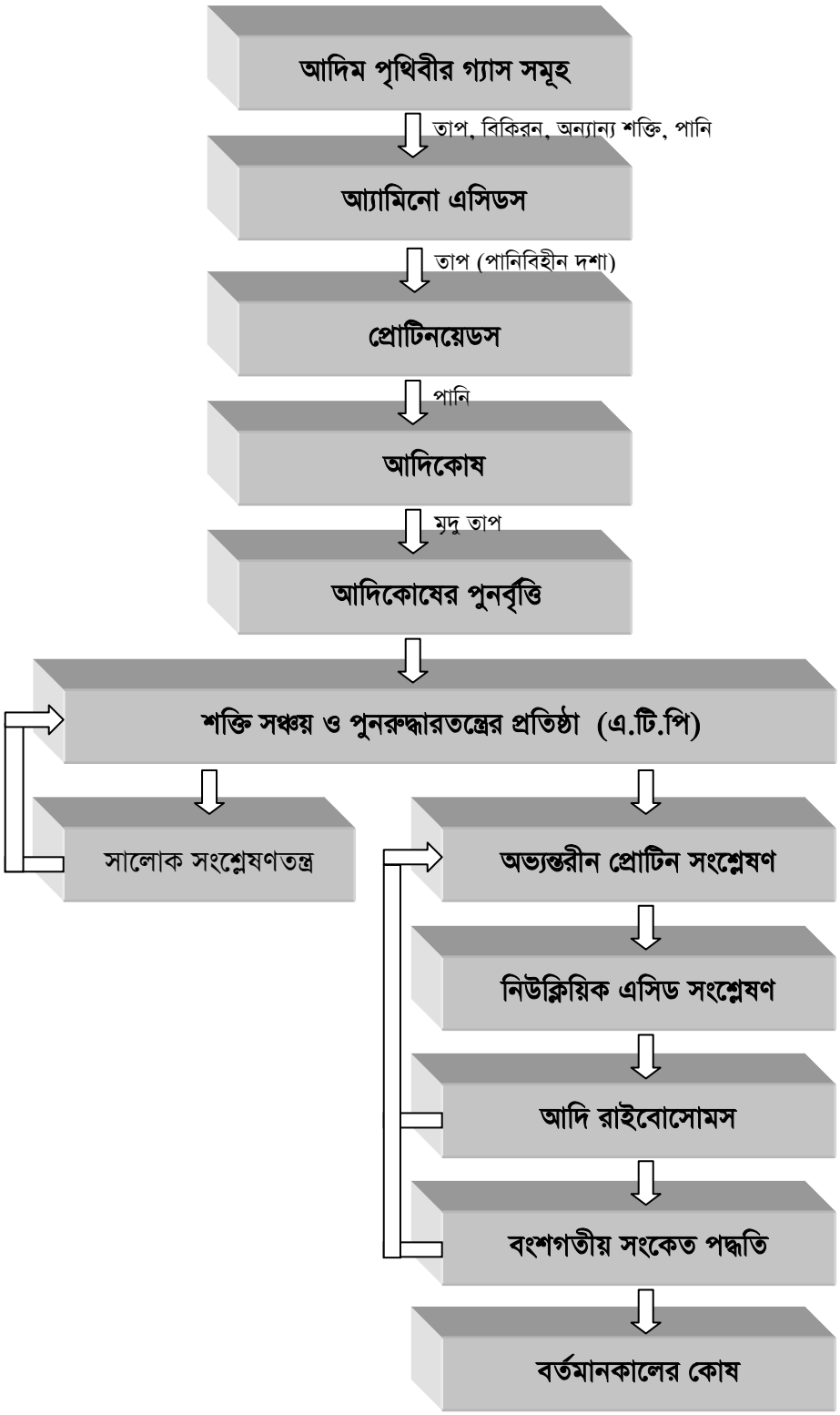

চিত্র : আদিম পরিবেশ থেকে জৈববস্তুর উৎপত্তি ও তাদের আন্তঃ সম্পর্ক ও বিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে জীবনের উৎপত্তির রূপরেখা

জটিলতা বৃদ্ধির ব্যাপারটি আরো পরিস্কার হবে আজকের দিনের কোষগুলোর সাথে আদি কোষ বা 'প্রটোসেল' -এর তুলনা করলে। আদি কোষগুলোতে কোন জেনেটিক তথ্য ছিল না; অর্থাৎ ছিল না কোন ডি.এন.এ এবং আর.এন.এ, যা আজকের দিনের কোষগুলোর একটি অত্যাবশ্যকীয় বৈশিষ্ট।

এ প্রসঙ্গে দু'চার কথা বলা যাক। আমরা আজ জানি যে, সমস্ত জীবিত বস্তু, সে উদ্ভিদই হোক আর প্রাণিই হোক, তার প্রকৃতি নির্দেশিত হয় বংশগতির বাহক - 'জীনের' কতকগুলো জটিল রাসায়নিক অণুর অঙ্গুলি হেলনে। জীনের এই রাসায়নিক অণুগুলো হল ডি.এন.এ এবং আর.এন.এ; এই দুই হারমোনিয়াম আর তবলার সমন্বিত সংযোগেই রচিত হয়েছে আমাদের জীবন-সঙ্গীতের সুর। ডি.এন.এ হচ্ছে ডি অক্সি রাইবো নিউক্লিয়িক এসিড এবং আর.এন.এ হল রাইবো নিউক্লিয়িক এসিডের সংক্ষিপ্ত রূপ। এই ডি.এন.এ এবং আর.এন.এ যেমন নির্ধারণ করছে আমার মাথায় কোকরানো চুল কেন, আর ফুটবলার জিদানের মাথায় টাক কেন, তেমনি ভাবে বলে দিচ্ছে চিতাবাঘের গায়ে কালো ফুটকি কেন, আর কেনই বা তাল গাছ এত লম্বা! হাজার হাজার ছোট ছোট কোষ দিয়ে তৈরী হয়েছে আমাদের দেহ। জটিলতার পথ বেয়ে এমনভাবে কোষগুলো বিবর্তিত হয়েছে যে সামান্য অতিক্ষুদ্র একটা কোষে সৃষ্টির সমস্ত জটিল তথ্যগুলো সন্নিবেশিত থাকে। এই জটিল তথ্যগুলোকেই বিজ্ঞানীরা বলছেন - *ব্লু প্রিন্ট অব লাইফ*। এই ব্লু প্রিন্টের রহস্য বিজ্ঞানীরা যে অনেকটাই সমাধান করে ফেলেছেন তা কিন্তু আজ নিঃসন্দেহে বলা যায়।

সম্ভাবনার জগৎ ও প্রাকৃতিক নির্বাচন:

অনেকেই মনে করেন, আমাদের এই পৃথিবীতে প্রাণের সৃষ্টি স্রেফ একটা আক্সিডেন্ট বা চান্স। ঘটনাচক্রে দৈবাৎ (by chance) প্রাণের উল্লম্ফন ঘটেছে । এ যেন অনেকটা হঠাৎ লটারী জিতে কোটিপতি হওয়ার মতই একটা ব্যাপার। বিজ্ঞানী মুলার এ ধরনের সম্ভাবনায় বিশ্বাস করতেন। কম সম্ভাবনার ঘটনা যে ঘটে না তা নয়। অহরহই তো ঘটছে। ভূমিকম্পে বাড়ী-ঘর ধবসে পড়ার পরও দেখা যাচ্ছে অনেক সময়ই দেখা গেছে প্রায় অলৌকিকভাবেই ভগ্নস্তুপের নীচে কেউ বেঁচে আছেন। নিউইয়র্ক টাইমস-এ একবার এক মহিলাকে নিয়ে প্রতিবেদন ছাপা হয়েছিল যিনি দু দুবার *নিউজার্সি লটারির* টিকেট জিতেছিলেন। তারা এই ঘটনার সম্ভাবনা হিসেব করে দেখেছিলেন ১৭ ট্রিলিয়নে ১। এত কম সম্ভাবনার ব্যাপারও কিন্তু ঘটছে। কাজেই প্রাণের আবির্ভাব যত কম সম্ভাবনার ঘটনাই হোক না কেন, ঘটতেই পারে।

কিন্তু জীববিজ্ঞানীদের কাছে স্রেফ সম্ভাবনার মার প্যাচ থেকেও ভাল উত্তর আছে, প্রাণের আবির্ভাবের পেছনে। সেইটি কী, তা বলবার আগে আমাদের প্রাণের উন্মেষের সম্ভাবনাটি

হিসেব করা যাক। ধরা যাক, আমাদের গ্যালাক্সিতে ১০^{১১} টি তারা আর ১০^{৬০} টি ইলেকট্রন আছে। দৈবাৎ এ ইলেকট্রন গুলো একত্রিত হয়ে আমাদের গ্যালাক্সি, ঠিক এতগুলো তারা, আমাদের পৃথিবী এবং শেষ পর্যন্ত এই একটি মাত্র গ্রহে উপযুক্ত পরিবেশে প্রথম কোষটি গঠনের সম্ভাবনা কত? আমাদের গ্যালাক্সি এবং পৃথিবীর যে বয়স, তা কি ওই সম্ভাবনা সফল করার জন্য যথেষ্ট? এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া খুব কঠিন। কারণ এই সম্ভাবনা মাপতে গেলে যে হাজারটা চলক নিয়ে কাজ করতে হয়, তার অনেকগুলো সম্বন্ধে আমরা এখনও ঠিকমত জানি না। তবে কৃত্রিম একটা উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটিকে সহজে ব্যাখ্যা করা যায়। কেয়রেন্স-স্মিথ (Cairns-Smith, 1970) এমনি একটি কৃত্রিম উদাহরণ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন ধরা যাক একটা বানরকে জঙ্গল থেকে ধরে নিয়ে এসে টাইপরাইটারের সামনে বসিয়ে দেয়া হল। তারপর তার সামনে ডারউইনের 'প্রজাতির উদ্ভব' নামক বইটি খুলে এর প্রথম বাক্যটি টাইপ করতে দেয়া হল। বাক্যটি এরকম :

> When on board HMS Beagle, as a naturalist, I was much struck with certain facts in the distribution of the inhabitants of South America, and in the geological relations of the present to the past inhabitants of that continent.

এই লাইনটিতে ১৮২ টি অক্ষর আছে। বানরটিকে বলা হল এই লাইনটিকে সঠিকভাবে কাগজে ফুটিয়ে তুলতে। এখন বানর যেহেতু অক্ষর চিনে না, সেহেতু সে টাইপ্রাইটারের চাবি অন্ধভাবে টিপে যাবে। টিপতে টিপতে দৈবাৎ একটি শব্দ সঠিক ভাবে টাইপ হতেও পারে। কিন্তু একটা শব্দ টাইপ হলে চলবে না, পুরো বাক্যটি সঠিকভাবে যেমনিভাবে লেখা আছে - ঠিক তেমনিভাবে- টাইপ হতে হবে। মানে শধু সবগুলো শব্দ সঠিক ভাবে টাইপ নয়, এর ধারাবাহিকতাও রাখতে হবে। এখন এই বানরটির এই বাক্যটি সঠিকভাবে টাইপ করার সম্ভাবনা কত? কত বছরের মধ্যে অন্ততঃ একবার হলেও বানরটি সঠিকভাবে বাক্যটি টাইপ করতে পারবে? সম্ভাবনার নিরিখে একটু বিচার-বিশ্লেষণ করা যাক।

মনে করা যাক যে, টাইপরাইটারটিতে ৩০ টি অক্ষর আছে এবং বানরটি প্রতি মিনিটে ৬০ টি অক্ষর টাইপ করতে পারে। শব্দের মধ্যে ফাঁক-ফোকর গুলো আর বড় হাত-ছোট হাতের অক্ষরের পার্থক্যের জটিলতা এই গণনায় না এনেও দেখা গেছে, পুরো বাক্যটি সঠিকভাবে টাইপ করতে সময় লাগবে ১০^{৮০} বছর, মানে প্রায় অনন্তকাল! কিন্তু যদি এমন হয় যে, একটি সঠিক শব্দ লেখা হবার সাথে সাথে সেটিকে আলাদা করে রাখা হয়, আর বাকী অক্ষর গুলো থেকে আবার নির্বাচন করা হয় বানরের সেই অন্ধ টাইপিং এর মাধ্যমে, তবে কিন্তু সময় অনেক কম লাকবে, তারপরও ১৭০ বছরের কম নয়। কিন্তু যদি এই নির্বাচন শব্দের উপর না হয়ে অক্ষরের উপর হয়ে থাকে (অর্থাৎ, সঠিক অক্ষরটি টাইপ হওয়ার সাথে সাথে এটিকে আলাদা

করে রেখে দেয়া হয়); তবে কিন্তু সময় লাগবে মাত্র ১ ঘন্টা, ৩৩ মিনিট, ৩০ সেকেন্ড।

অনেকেরই হয়ত জানা নেই জীবজগতেও এই অক্ষর নির্বাচনের মতই একধরনের নির্বাচন সৃষ্টির শুরু থেকেই চলে আসছে, এটাকে বলে ***প্রাকৃতিক নির্বাচন*** *(Natural Selection)*। প্রাকৃতিক নির্বাচনের ব্যাপারটা কিন্তু ভারী মজার। রোমান্টিক ব্যক্তিরা হয়ত এর মধ্যে রোমান্সের গন্ধ পাবেন। জীব জগতে স্ত্রীই হোক আর পুরুষই হোক কেউ হেলা ফেলা করে মেশে না। মন-মানসিকতায় না বনলে, প্রকৃতি পাত্তা দেবে না মোটেই। প্রকৃতির চোখে আসলে লড়াকু স্ত্রী-পুরুষের কদর বেশী। প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে আসলে প্রকৃতি যোগ্যতম প্রতিদ্বন্দ্বীকে বেছে নেয়, ফলে একটি বিশেষ পথে ধীর গতিতে জীবজন্তুর উন্নতি ও পরিবর্তন ঘটতে থাকে। অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক রিচার্ড ডকিন্স, এই 'ন্যাচারাল সিলেকশন' কে 'ব্লাইন্ড ওয়াচমেকার' হিসেবে অভিহিত করেছেন। তিনি তার বিখ্যাত '**The Blind Watchmaker**: Why the Evidence of Evolution Reveals a Universe Without Design' বইয়ে বলেন :

> Natural selection, the unconscious, automatic, blind yet essentially non-random process that Darwin discovered, has no purpose in mind. If it can be said to play the role of watchmaker in nature, it is the blind watchmaker.

অধ্যাপক ডকিন্স সহ অনেক জীববিজ্ঞানীই মনে করেন, স্রেফ 'চান্স' নয়, পৃথিবীতে প্রাণের উদ্ভব আর বিকাশ ঘটেছে আসলে প্রাকৃতিক নির্বাচনের প্রভাবে। তাই সময় লেগেছে অনেক কম। প্রাকৃতিক নির্বাচন ছাড়া বিবর্তন হলে জীবজগৎ এত কম সময়ে এভাবে বিবর্তিত হত না।

আমরা অগামী পর্বে একটা কৌতুহোদ্দীপক বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। আমাদের এই পৃথিবী ছাড়াও মহাকাশের অন্যান্য গ্রহে প্রাণের বিকাশ ঘটেছে কিনা, ঘটলে তার প্রকৃতিই বা কিরকম হবে, কিংবা এর সম্ভাবনাই বা কতটুকু - তা নিয়ে হবে এই আলোচনা। জীববিজ্ঞানের এক অদ্ভুত শাখা সাম্প্রতিক সময়ে খুব জনপ্রিয় হয়েছে বিজ্ঞানীদের মাঝে, এর নাম 'Exobiology' , যার বাংলা করলে বলতে পারি *মহাকাশ জীববিদ্যা*। আমরা জীববিজ্ঞানের ওই নতুন শাখাটির সাথে কিছুটা পরিচিত হব। আর ওটি দিয়েই শেষ হবে আমার 'প্রাণের প্রাণ জাগিছে তোমারি প্রাণে' সিরিজটি।

সবাইকে ধন্যবাদ।

অভিজিৎ
charbak_bd@yahoo.com
October 30, 2004